কালের কণ্ঠ

তারিখ ..22 FEB 2017...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...6...

দেশ ছাড়ছেন মেধাবীরা

শরীফুল আলম সুমন ▷

অকাজের লেখাপড়া শেষ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আমিনুর রহমান, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সোহেলী খাদিজা আজাদ এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোস্তাইম বিল্লাহ ২০১৪ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যান। শিক্ষা ছুটি শেষে গত বছর তাঁদের ফিরে আসার কথা ছিল। তবে তিনজনের কেউই ফেরেননি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একাধিকবার চিঠি দিয়েও তাঁদের কাছ থেকে কোনো উত্তর পায়নি। শেষে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

দেশ ছাড়ছেন মেধাবীরা

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

সভায় তিনজনকেই চাকরিচ্যুত করা হয়।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, মেধাবী শিক্ষার্থীরা সরকারের টাকায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা সরকারি বৃত্তি নিয়েই বিদেশে যান। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও পিএইচডিসহ উচ্চতর ডিগ্রি নিতে বৃত্তি নিয়ে বিদেশে যান। তবে এই শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ পরে আর দেশে ফিরে আসেন না। ফলে সরকার মেধাবী শিক্ষার্থীদের পেছনে অর্থ খরচ করলেও তার পুরোপুরি সুফল পাচ্ছে না।

তবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বলছেন, মেধাবী ছাত্র-শিক্ষকরা দেশকে কতটুকু দিচ্ছেন তারও হিসাব করা দরকার। সরকার কিভাবে একজন মেধাবীকে মূল্যায়ন করছে তাও ভেবে দেখতে হবে। মেধাবীদের মধ্যে যাঁরা বিদেশে চাকরি করছেন তাঁদের অনেকেই দেশেও কাজ করতে চান। কিন্তু তাঁদের যে সুবিধা দরকার তা নিশ্চিত করা হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে কিভাবে মেধাবীদের ধরে রাখতে হবে সে চিন্তাও সরকারকেই করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন (গত ডিসেম্বরে প্রকাশিত) থেকে জানা যায়, সরকারি ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদালয় বাদে ২০১৫ সালে শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ৫৩১ জন। এর মধ্যে কর্তব্যরত শিক্ষক ছিলেন ৯ হাজার ৭৫৩ জন। বাকিদের মধ্যে এক হাজার ৮৩০ জন ছিলেন শিক্ষা ছুটিতে, প্রেষণে ছিলেন ১৪২ জন, বিনা বেতনে ছুটিতে ছিলেন ৬৭ জন, অননুমোদিতভাবে ছুটিতে ছিলেন ১৫ জন এবং চুক্তিভিত্তিক অন্যান্য পর্যায়ে ছিলেন ৭২৪ জন। অর্থাৎ মোট শিক্ষকের ২২ শতাংশই কর্তব্যে অনুপস্থিত ছিলেন।

ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি শিক্ষা ছুটিতে যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজার ৩০৬ জন শিক্ষকের মধ্যে ওই সময় কর্তব্যরত ছিলেন এক হাজার ৫১৪ জন। আর ২৭৯ জন ছিলেন শিক্ষা ছুটিতে, ৩৭ জন ছিলেন প্রেষণে, অননুমোদিতভাবে ও বিনা বেতনে অনুপস্থিত ছিলেন ৪৭৬ জন শিক্ষক। একই সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হাজার ২৩০ জন শিক্ষকের মধ্যে ছুটিতে ছিলেন ১৪২ জন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক হাজার ১৮০ জন শিক্ষকের মধ্যে ছুটিতে ছিলেন ১৩৭ জন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৩৬ জন শিক্ষকের মধ্যে ছুটিতে ছিলেন ১০২ জন। ছুটিতে থাকা শিক্ষকদের অধিকাংশই দেশের বাইরে ছিলেন, যাঁদের বেশির ভাগই ছুটি শেষেও আর দেশে ফিরছেন না।

ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা পাবলিক ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট বানাতে সরকারকে একেকজন শিক্ষার্থীর পেছনে বছরে এক লাখ ৩০ হাজার টাকা ভর্তুকি দিতে হয়। এসব শিক্ষার্থীর চিন্তা করা উচিত তারা জনগণের টাকায় পড়েছে। তাদের দায়বদ্ধতা থাকা উচিত। আর বাংলাদেশে মেধাবীরা এখন চাকরিজীবনে যে সুবিধা পায় তা দেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কম নয়। তা সত্ত্বেও অনেকে বিদেশে পড়তে গিয়ে আর ফিরে আসে না। অথচ এসব মেধাবীর কাছ থেকে দেশ অনেক কিছু পেতে পারত।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রতিবছর প্রায় সাত লাখ শিক্ষার্থী এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তবে উচ্চশিক্ষার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন রয়েছে মাত্র ৪৫ হাজার। ফলে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের তুমুল প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। সবচেয়ে মেধাবীরাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়। বাকিদের ভরসা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে বেশি মেধাবী তাঁরাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতার সুযোগ পান। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থীকে নিজ খরচে পড়তে হলেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবীদের পড়ালেখার প্রায় পুরো খরচই বহন করছে সরকার। শিক্ষার্থীরা মাসে ২৫ থেকে ১০০ টাকা বেতন দিলেও একেকজন শিক্ষার্থীকে গ্র্যাজুয়েট করার পেছনে সরকারের খরচ হয় তিন থেকে চার লাখ টাকা। অথচ এসব শিক্ষার্থীর একটা অংশ গ্র্যাজুয়েশন শেষে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গেলেও পরে আর দেশে ফিরছেন না।

ইউজিসিও তাদের প্রতিবেদনে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, প্রতিবছর দেশের সদ্য স্নাতক ডিগ্রিপ্রাপ্ত সেরা শিক্ষার্থীরা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার জন্য বিদেশে যাচ্ছেন। পরে তাঁদের বেশির ভাগই দেশে ফিরছেন না। এতে দেশ এই মেধাবী তরুণদের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, পাশাপাশি দেশে এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ে গবেষণার উৎকর্ষ সাধন ব্যাহত হচ্ছে।

এ অবস্থায় শিক্ষাবিদদের অনেকে বলছেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়ে তারা সবাই দরিদ্র নয়। শিক্ষার পেছনে এর চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় করার সক্ষমতা আছে তাদের পরিবারের। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না তারা ঠিকই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেই পড়ালেখা করছে। তাই এত ভর্তুকি না দিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বেতন ও অন্যান্য খরচ বাড়ানো উচিত।

জানা যায়, ২০১৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ব্যয় ছিল ৯৭ হাজার ৪৪১ টাকা। এ ছাড়া বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ৯৪ হাজার ৩২৭ টাকা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৪ হাজার ৮৯৭ টাকা, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লাখ ছয় হাজার ২৮৩ টাকা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এ হার ছিল ৫৫ হাজার ৫৮২ টাকা। বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ব্যয় ছিল আরো অনেক বেশি। এ টাকার প্রায় পুরোটাই বহন করেছে সরকার।

আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে ২০১৫ সালে শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ব্যয় ছিল ৮৯ হাজার ৬৮৮ টাকা। আর আহ্ছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯৭ হাজার ৯৭৭ টাকা, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে এক লাখ ৫৯ হাজার ৩১৪ টাকা এবং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে ব্যয় হয়েছিল এক লাখ ৯০ হাজার ৮০৩ টাকা। এভাবে নামিদামি সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ব্যয় ছিল লাখ টাকার ওপরে। বাস্তবে এর চেয়েও অনেক বেশি টাকা পরিশোধ করতে হয় শিক্ষার্থীদের। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচের প্রায় পুরোটা সরকার দিলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোটাই জোগান দিতে হয় শিক্ষার্থীর পরিবারকে।

ইউজিসিও তাদের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশে বলেছে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে নিজস্ব আয় বাড়ানো হচ্ছে না। আয় বাড়ানোর সম্ভাব্য উপায় হচ্ছে শিক্ষার্থীদের বেতন ও আবাসিক হলের সিট ভাড়া বৃদ্ধি। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বদাই দ্বিধাগ্রস্ত থাকে। শিক্ষার্থীদের বেতন থেকে যে আয় হয় এবং তা সংগ্রহে যে ব্যয় হয়, তা আয়ের থেকে অনেক ক্ষেত্রেই বেশি। শিক্ষার্থীদের বেতন বৃদ্ধি এবং আবাসিক হলে সিট ভাড়া বৃদ্ধি একটি যৌক্তিক প্রস্তাব। এ প্রস্তাব বাস্তবায়নে প্রয়োজন জাতীয় আকাঙ্ক্ষা। এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হলো।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিতে যাওয়া শিক্ষকরা প্রথমে যান শিক্ষা ছুটিতে। ওই ছুটি শেষেও অনেক শিক্ষকই দেশে না ফিরে ওই দেশে থেকে যান বিনা বেতনে বা অননুমোদিত ছুটিতে। এই শিক্ষকদের বেশির ভাগই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ালেখা করেছেন।

ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'যেসব মেধাবী শিক্ষার্থী বিদেশে গিয়ে ফিরে আসে না তাদের দেশপ্রেম ও সত্যনিষ্ঠার অভাব রয়েছে। তারা সরকারের পয়সায় পড়ালেখা করে দেশ ও জাতিকে বঞ্চিত করছে। আর আমাদের আইনেরও কিছু দুর্বলতা রয়েছে। পাঁচ বছর পর্যন্ত ছুটি দেওয়া হয়, তাও বেতনসহ। বিশেষ করে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং পড়ালেখার জন্য বিদেশে যায়, তাদের ক্ষেত্রে নিয়ম করা উচিত তাদের ফিরে আসতেই হবে। আর কেউ যদি একান্তই ফিরে না আসে, তাহলে চাকরি শুরুর পর রাষ্ট্র তাদের পেছনে যা খরচ করেছে তা ফেরত দেওয়া উচিত।'

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'যেসব মেধাবী শিক্ষক বিদেশে পিএইচডি করতে যান তাঁদের কেউ কেউ বেশি টাকা রোজগারের আশায় সেখানে থেকে যান। এখন ওই শিক্ষক যদি শিক্ষা ছুটিতে থাকার সময়ে সরকারের কাছ থেকে নেওয়া টাকাটা ফেরত দেন তাহলে খুব একটা সমস্যা নেই। কারণ তিনি তো বিদেশে রোজগার করে দেশেই রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। তবে তাঁদেরও উচিত কয়েক বছর থেকে কিছু টাকা রোজগার করে দেশে ফিরে আসা। কিন্তু কেউ যদি সরকারের টাকা পরিশোধ না করেন তাহলে তাঁকে অবশ্যই আইনের আওতায় এনে বিচার করা উচিত। আমি মনে করি, যেসব ক্ষেত্রে বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষিসহ বেশ কিছু বিষয়ে বিদেশে গিয়ে ডিগ্রি গ্রহণ শেষে অবশ্যই ফিরে আসা উচিত। কারণ তাঁদের চিন্তা করা উচিত, তাঁরা জনগণের পয়সায় পড়েছে। এর প্রতিদান দেওয়া উচিত। আসলে যাঁদের দেশের প্রতি মমত্ববোধ নেই তাঁরাই বিদেশে থেকে যান। বিদেশে না থেকে সবাই মিলে চেষ্টা করলে আমরা আমাদের দেশটাকেই উন্নত রাষ্ট্র বানাতে পারি। মালয়েশিয়া সরকার তাদের শিক্ষার্থীদের ইংল্যান্ডসহ কিছু দেশে পড়তে উৎসাহিত করে, এমনকি খরচও দেয়। তবে শর্ত থাকে, পড়ালেখা শেষে অবশ্যই দেশে ফিরে আসতে হবে। তাদের শিক্ষার্থীরা ফিরে আসছে বলেই তারা সব ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করছে।'

আবার গবেষণাকেই বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা নিয়েই প্রচণ্ড অনীহা রয়েছে। ২০১৫ সালে বেসরকারি ৮৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গবেষণা খাতে ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয় কোনো বরাদ্দ রাখেনি। এ খাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মোট ব্যয় ছিল ৮১ কোটি টাকা। ৫৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটির গবেষণায় গড় ব্যয় ছিল প্রায় দেড় কোটি টাকা।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, 'গবেষণা ছাড়া উচ্চশিক্ষা হয় না। অথচ আমদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা পুরোটাই চলছে গবেষণা ছাড়া। ফলে শিক্ষার্থীরা দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না। আর এর প্রভাব পড়ছে চাকরির বাজারে। গবেষণা ছাড়া উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করে অধিকাংশ স্নাতকই আশানুরূপ চাকরি পাচ্ছে না। আর যারা ভালো করছে তাদের বড় অংশ দেশত্যাগ করছে।'